বাণিজ্য-সম্পর্কেও সে সময়ে তারা সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে, তাতে সন্দেহ নেই। তা হলে শুধু কৃষক নয়, এই শেষের দিকে (খ্রীঃ ৪০০—খ্রীঃ ১,০০০-এর মধ্যে ?) বাঙ্‌লায় বণিক শ্রেণীও উদ্ভূত হচ্ছিল, ছোট ছোট নগর-বন্দরও ছিল। অর্থাৎ কৃষি ও পণ্য উৎপাদন খানিকটা বৃদ্ধি পেয়েছে; এমন নয় যে, কৃষি নেই, বণিকই বাংলা দেশে প্রথম পত্তন স্থাপন করেছে। সহজেই বোঝা যায়, এরূপ স্বয়ংসম্পূর্ণ পল্লীসমাজে বণিক-শক্তির বিকাশের সুযোগ আসলে বেশি ছিল না। তদুপরি, জাতিভেদের বাধায় সমুদ্রযাত্রাও ক্রমে নিষিদ্ধ হয়ে পড়ে। ক্রমে ৮ম থেকে ১২শ শতকে বহিঃসমুদ্রে মুসলমান আরবরা রাজ্যে ও বাণিজ্যে অধিকার স্থাপন করে, ভারতীয় বণিকদের বাণিজ্যযাত্রা বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। এবং সর্বশেষে হয়তো রাজশক্তি বণিকশক্তিকে খর্ব করে;—হিন্দু সেন-রাজারা বেনেদের (বৌদ্ধ বলে ?) সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয় করে দেয়—'বল্লালচরিত'-এর এ-কথা সেই সত্যেরই প্রমাণ। সম্ভবত এসব কারণে এই বাঙালী বণিকশ্রেণী উৎপাদকশক্তিরূপে আর বেশি বিকাশ লাভ করেনি। পালদের (?) পরে তারা বহির্বাণিজ্য খুইয়ে অন্তর্বাণিজ্যেই নিবদ্ধ হয়ে থাকে। তাই বেনেদের প্রভাব-বৈভবের কথা তারপরে বেঁচে থাকে বাঙালীর ব্রতকথায় উপাখ্যানে, আর সেই সূত্রে বাঙালীর সাহিত্যে।

সাংস্কৃতিক পরিচয়

মোটের উপর বিচ্ছিন্ন গণ্ডিবদ্ধ পল্লীসমাজের পরিবেশেই বাঙ্‌লা সাহিত্যের জন্ম; এই সাহিত্যের বায়ুমণ্ডল সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধ জীবনের মধ্যে প্রাচীন বাঙ্‌লা সাহিত্যের বড় অবলম্বন ছিল তার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার—বিশেষ করে হিন্দু-আর্য সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার। দু'রকমের রচনায় আমরা তার পরিচয় পাই—যথা—এক, বাঙালী-রচিত সংস্কৃত সাহিত্য; আর-এক, বাঙালী-রচিত অবহট্‌ঠ খণ্ড-কবিতা। এই দুই সাহিত্যের ভাব, রীতি, অলঙ্কার প্রভৃতি থেকে বুঝতে পারি প্রাচীন বাঙালীর মানস-লোক কিরূপ ছিল এবং তাদের সাহিত্যাদর্শ ছিল কি ধরনের। বুঝি যে বাঙালী কবি যখন এর পর সত্যসত্যই বাঙ্‌লায় সাহিত্য রচনায় যত্নপর হবেন, তখন স্বভাবতই এই ঐতিহ্য, এই মনোজগৎ ও এই সাহিত্যাদর্শের ছাপ এসে যাবে বাঙ্‌লা লেখায়ও। বাঙ্‌লা সাহিত্যের পক্ষে তাই বাঙালী লেখকের এই সংস্কৃতে রচিত ও অবহট্‌ঠে রচিত সাহিত্যের মূল রূপটিও লক্ষণীয়।

লোক-কাহিনী হিসাবে তা ছিল বাঙালী জনগণের মুখেই নিবদ্ধ। উচ্চকোটির শিক্ষিতরা তা লিপিবদ্ধ করেন নি।

সামাজিক বনিয়াদ

এই সব ছিল প্রাচীন বাঙ্‌লা সাহিত্যের ভাববস্তু বা বিষয়বস্তু। বাঙ্‌লার যে সামাজিক অবস্থায় প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাঙ্‌লা সাহিত্য উদ্ভূত হয়, দুর্ভাগ্যক্রমে সে-অবস্থার প্রামাণিক তথ্য বিশেষ পাওয়া যায় না। এই সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে কয়েকটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। প্রথমত, যা প্রাচীন ভারতীয় সমাজের প্রধান সত্য তা বাঙ্‌লার ক্ষেত্রেও ছিল সত্য—এ সমাজ ছিল মোটের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আত্মনির্ভর পল্লীসমাজে (Village Communities) বিভক্ত। গ্রামের উৎপাদনেই মোটের উপর গ্রামবাসীর জীবন-যাত্রা নির্বাহ হত ; বাইরের সামান্য জিনিসই আনানেওয়া চলত। পল্লীর উৎপাদন পল্লীর নিজ প্রয়োজন মতো হলেই হল, উৎপাদন-বৃদ্ধির তাগিদ ছিল সামান্যই। দ্বিতীয়ত, ভারতের অন্যত্র যেমন বাঙ্‌লা দেশেও তেমনি এই পল্লীসমাজ ছিল কৃষি-প্রধান সমাজ ; আর কৃষির যন্ত্রপাতি ও কৃষি-পদ্ধতি ছিল গতানুগতিক ; এখনো প্রায় তা-ই আছে। তাই পল্লীর প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপাদন নিয়ে বড় রকমের সমস্যা বেশি হত না। অবশ্য ভারতবর্ষের অন্যত্রের মতো বাঙ্‌লায়ও এই উৎপাদনের প্রধান অংশ যেত গ্রামের উচ্চবর্গের সেবায় (যেমন, রাজপুরুষ, রাজসেবক, ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ ও জৈন গুরু, করণ প্রভৃতি), সামন্ত গোষ্ঠীর নানা স্তরের ভূস্বামীর হাতে। সাধারণ ক্ষুদ্র ভূস্বামী ও কৃষক অবশ্যই দেশে সংখ্যায় বেশি ছিল। কিন্তু শূদ্র পর্যায়ের ভূমিহীন সেবক-জাতীয় কৃষিজীবী ও কারুজীবীরা (হালিক, জালিক, ডোম, বাগ্‌দী, শবর প্রভৃতি ; তারা কেউ কেউ ভূমিজ অন্ত্যজ,—প্রাচীনতম উপজাতির বংশধর) ছিল অনাচরণীয়, গ্রামান্তেবাসী (এখনকার মতোই), এবং নিতান্ত হীনাবস্থ ;—অবশ্য তারাই ছিল উৎপাদনের প্রধান বাহন। বলাই বাহুল্য, মাঝে-মাঝে এই বৈষম্য নানা ধরনের বিরোধেও রূপ লাভ করত। কিন্তু আরও একটা কথা আছে—প্রাচীন বাঙালী সমাজের তা একটা উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। বাঙ্‌লার মঙ্গল-কাব্য ও ব্রতকথাগুলিতে দেখি, বেনেরা (মধ্যযুগের বাঙ্‌লায় তাদের নাম হল 'সওদাগর') ছিল সমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তিশালী। ইতিহাসের সাক্ষ্য বলে, তাম্রলিপ্ত ছিল প্রাচীন ভারতে প্রধানতম এক বন্দর—এখান থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ঔপনিবেশিকেরা (হয়তো গুপ্ত যুগ থেকে পাল যুগ পর্যন্ত) গিয়েছে ; আর যবদ্বীপ, সিংহল, সুবর্ণদ্বীপের সঙ্গে

এই সংস্কৃতিকে বলা চলে 'প্রাচীন হিন্দু-সংস্কৃতি'—যদিও তারও অনেক স্তর আছে; দেশভেদে, সম্প্রদায়ভেদে তার অনেক প্রকার-ভেদও ছিল। তথাপি তার তিনটি প্রধান লক্ষণ সমস্ত ভারতে এই সেদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল—যথা, এই হিন্দু-সংস্কৃতির বাস্তব জীবনযাত্রা ছিল পল্লী-সভ্যতার উপযোগী বাহুল্যহীন; সমাজ ছিল জাতি-ভেদে বিভক্ত, এবং আধ্যাত্মিক চিন্তায় শুধু পরজন্মে নয়, 'প্রাক্তন' বা কর্মফলেও বিশ্বাস ছিল সুগভীর। এগুলোকে তাই বলতে পারি 'সর্ব-ভারতীয়' জিনিস। অবশ্য প্রাচ্য ভারতের এই পূর্ব-প্রান্তে সেই প্রাচীন হিন্দু-সংস্কৃতিও এখানকার নৈসর্গিক পরিবেশে ও এই বহুমিশ্রিত বাঙালী জাতির সামাজিক পরিবেশে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ও ঐশ্বর্যলাভ করেছিল, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তবু স্মরণীয় এই যে, এই বৈশিষ্ট্যও ছিল গৌণ। যাঁরা সংস্কৃতিমান্ ও উচ্চকোটির চিন্তার পক্ষপাতী, বাঙ্‌লা দেশেও তাঁদের চেষ্টা ছিল এই হিন্দ্-আর্য সংস্কৃতিকে বা ভারতের হিন্দু-সংস্কৃতির মূল ধারাকে যথাসম্ভব মান্য করা। তাই এই সংস্কৃতি ছিল বাঙালী সাহিত্যিকের একটি উত্তরাধিকার। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণ থেকে তা বাঙ্‌লাকে একদিকে যুগিয়েছে বিষয়বস্তু (যাকে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন Matter of Sanskrit) এবং অন্যদিকে অনেকাংশে দান করেছে বাঙালীর কাব্যাদর্শ। প্রাচীন বাঙালী সাহিত্যিকের সাহিত্যিক ঐতিহ্যও ছিল সর্বভারতীয় কাব্য, অলঙ্কার, দর্শন ও ধর্মের।

কিন্তু যারা বাঙ্‌লার প্রাকৃত জন তারা জাতি হিসাবে মূলত সেই হিন্দ্-আর্য গোষ্ঠীর নয়। অবশ্য হিন্দ্-আর্য ভাষা তারা গ্রহণ করে, কিন্তু সেই সংস্কৃতির উচ্চকোটির চিন্তায় বা আচার-নিয়মে তাদের অধিকারও ছিল না। বাহুত অবশ্য সেই হিন্দ্-আর্য সংস্কৃতিকে তারাও গ্রহণ করেছিল; কিন্তু বাঙ্‌লার এই জন-শ্রেণী জীবন-যাত্রায়, আচারে-নিয়মে, ভাবনায়-কল্পনায় নিজেদের প্রাচীনতর ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও যথেষ্টই বহন করে চলেছিল। এমন কি, পরবর্তী কালের লোক-সংস্কৃতির মধ্যেও সে-সব জীবিত ছিল—যেমন, রূপকথায়, ব্রতকথায়, ছড়ায়, প্রবাদ-বচনে। এই লৌকিক ধারা, এটি বাঙালীর দ্বিতীয় উত্তরাধিকার। বাঙালী সাহিত্যিকের পক্ষেও কালক্রমে এই লৌকিক উত্তরাধিকার—কাহিনী ও চিন্তাধারা—লাভ করবার কথা। তা তাঁরা করেও ছিলেন—এইটিই অন্-আর্য বাঙালীর নিজস্ব বস্তু, বাঙ্‌লার খাঁটি জিনিস (যাকে বলা হয় Matter of Bengal)। মঙ্গল-কাব্যগুলির উপাখ্যানে, রাধাকৃষ্ণ কাহিনীর নানা অংশে তা স্পষ্ট। কিন্তু সেই প্রাচীন বাঙ্‌লা সাহিত্যের যুগে এই লৌকিক উত্তরাধিকার সাহিত্যে সমৃদ্ধীত হয় নি—লোক-গীতি,

যখন নেওয়া হচ্ছিল, বিবিধ অঞ্চলে লোকের মুখে ভাষা তখন আরও পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। সাহিত্যের প্রাকৃতগুলি তাই লোক-মুখের প্রাকৃতের ঘষামাজা রূপ; আর তাও আবার অনেকটা ধরাবাঁধা কৃত্রিম রূপ। এদিকে খ্রীঃ ৬০০ থেকে খ্রীঃ ১,০০০-এর মধ্যে লোকের মুখের ভাষা এভাবে পরিবর্তিত হতে হতে প্রাকৃতের যে-রূপ দাঁড়ায় তাকে আর তখনকার মানুষেরা প্রাকৃত বলত না; বলত 'অপভ্রংশ', চল্‌তি কথায় 'অবহট্‌ঠ' ('অপভ্রষ্ট')। এই অপভ্রংশ রূপই আবার ভেঙে-চুরে খ্রীঃ ১,০০০-এর দিকে নানা অঞ্চলে ভারতীয় নানা আধুনিক ভাষা রূপে জন্ম নিতে থাকে—যেমন, বাঙ্‌লা, মৈথিলী, ভোজপুরিয়া, অবধী (অযোধ্যার), ব্রজভাষা ইত্যাদি। কিন্তু একটা কথা জানা দরকার—আমরা 'শৌরসেনী অপভ্রংশে'রই লিখিত নিদর্শন পাই; অন্যান্য প্রাকৃতের 'অপভ্রংশ দশা'র প্রমাণ পাই না। এইজন্যই 'অবহট্‌ঠ' বলতেই বোঝায় 'শৌরসেনী অপভ্রংশ', অন্য অপভ্রংশগুলি ছিল অবজ্ঞেয়। আর পূর্বেই বলেছি রাজপুত রাজাদের প্রভাবে শৌরসেনী অবহট্‌ঠ খ্রীঃ ৮ম শতকের পর থেকে উত্তর-ভারতের প্রায় রাষ্ট্রভাষা হয়ে ওঠে। এই শৌরসেনী অবহট্‌ঠেরই বংশধর ব্রজভাষা, খাড়িবোলী; আর এ ভাষাই মুসলমানী প্রভাবে পরিণত হয় হিন্দোস্তানীতে। আধুনিক 'হিন্দী' এই হিন্দোস্তানীরই উপর গঠিত সংস্কৃতশব্দবহুল লিখিত ভাষা। উর্দূ সেই হিন্দোস্তানীরই উপর গঠিত পারসীশব্দবহুল লিখিত ভাষা; তাই হিন্দী ও উর্দূ কুলীন ভাষা। কিন্তু কথা এই—৮ম থেকে ১০ম শতকে উচ্চবর্গের মানুষ সংস্কৃত ছাড়া অন্য কোনও ভাষায় সাহিত্য রচনা করতে হলে তা রচনা করত 'অবহট্‌ঠ'তে। বাঙালী কবিও তাই তখন সংস্কৃতে আর অবহট্‌ঠতে কাব্য রচনা করতেন স্বচ্ছন্দে;—কারণ, বাঙ্‌লার বিদ্বজ্জনেরা এ-সব রচনারই সমাদর করতেন, বাঙ্‌লা রচনার নয়।

প্রাচীন বাঙ্‌লা সাহিত্যের পরিবেশ

সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার

বাঙালী যখন বাঙ্‌লা ভাষায় সাহিত্য রচনা করতে আরম্ভ করে তখন সে হাজার দেড়েক বৎসরের (খ্রীঃ পূঃ ৫০০ থেকে খ্রীষ্টীয় ১,০০০ অব্দের মধ্যে) ভারতের হিন্দ্‌-আর্য সংস্কৃতির ও হিন্দ্‌-আর্য ভাষার উত্তরাধিকারী। অবশ্য ততদিনে ভারতের আর্য-সংস্কৃতি বা বৈদিক সংস্কৃতি কতকটা কালক্রমে সামাজিক নিয়মে, আর অনেকটা এই দেশের প্রাচীনতর নানা অধিবাসীদের জীবনযাত্রা ও ধ্যানধারণার সঙ্গে সংমিশ্রণের ফলে, এক নিজস্ব ভারতীয় সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। সাধারণভাবে ভারতের

মাগধীর বংশধর বাঙ্‌লা ভাষা একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। কিন্তু তখনো বাঙ্‌লা দেশের উচ্চবর্গের মানুষেরা কাব্যচর্চা করতেন সংস্কৃতে, না হয় অবহট্‌ঠে (শৌরসেনী অপভ্রংশের চলিত নাম)। তার কারণ বোঝাও প্রয়োজন।

সংস্কৃত কোনো কালে কথ্যভাষা ছিল কি না সন্দেহ। কিন্তু সংস্কৃত মধ্যযুগেও অনেক দিন পর্যন্ত ছিল ভারতের উচ্চ-কোটির সংস্কৃতির বাহন। এখনো সে-সম্মান সে সম্পূর্ণ হারায় নি। প্রাচীন ভারতে বৈদিক যুগের পরে লোকে মুখে যে হিন্দ্‌-আর্য ভাষা বলত তার নাম ছিল 'প্রাকৃত', অর্থাৎ প্রাকৃত জনের ভাষা। কিন্তু কথিত ভাষা দ্রুত পরিবর্তিত হয়—কালভেদেও হয়, দেশভেদেও হয়। বিশেষত, আর্য-ভাষীরা যতই অন্যভাষীদের দেশে বিস্তার লাভ করতে থাকে, ততই সেই সব দেশের লোকের ভাষার প্রভাবও আর্য-ভাষীদের নিজেদের কথাবার্তায় আর্য-ভাষার উপর অল্পাধিক পড়তে থাকে। প্রাকৃতেরও তাই প্রথম যুগেই (খ্রীঃ পূঃ ১,০০০ থেকে খ্রীঃ পূঃ ৫০০র মধ্যে) দুই রূপ দেখা দেয়—'প্রাচ্য' ও 'উদীচ্য'। এর পরে সেই 'প্রাচ্য' প্রাকৃতেরও দুটি শাখা জন্মায়—একটি 'মাগধী', বিশেষ করে মগধ তার জন্মক্ষেত্র; আর একটি 'অর্ধ-মাগধী'—কোশল ছিল তার কেন্দ্র। অন্যদিকে পশ্চিমের 'মধ্যদেশে' (গঙ্গা-যমুনার অন্তর্বেদীতে ও শূরসেনদের রাজ্যে) উদ্ভূত হয় 'শৌরসেনী প্রাকৃত'। মৌর্য যুগে, মগধের মতোই মাগধী প্রাকৃতেরও মর্যাদা ছিল। কিন্তু তার পর থেকে উত্তর ভারতের প্রাণকেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় সেই অন্তর্বেদী শৌরসেনী অঞ্চল। তখন থেকে শৌরসেনী প্রাকৃতই উত্তর ভারতে প্রাধান্য অর্জন করে, মাগধী প্রাকৃত তুচ্ছ বলে গণ্য হয়। খ্রীষ্টীয় ৫ম শতকে বররুচি তাঁর 'প্রাকৃত-প্রকাশ' ব্যাকরণে কাব্য-সাহিত্যে প্রাকৃতের প্রয়োগ সম্পর্কে কতকগুলি ধরাবাঁধা নিয়মের উল্লেখ করেছেন। অবশ্য তারও আগে ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাটকের বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর মুখে প্রাকৃতের বিভিন্ন রূপের প্রয়োগের নিদর্শন পাওয়া যায়। যেমন, আমরা দেখি—সংস্কৃত নাটকে সংস্কৃত ভাষা বলে বীর নায়কেরা; 'শৌরসেনী প্রাকৃতে' কথা বলে রানী, রাজসখী প্রভৃতি অভিজাত মহিলারা; তারা গান গায় আবার 'মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে' (তা সুললিত ছিল বলে কি?); আর শকুন্তলার ধীবরদের মতো (সাধারণ শ্রমজীবী) মানুষেরা কথা বলে 'মাগধী প্রাকৃতে'; দস্যু ও ঘাতকেরা বলত 'পৈশাচী প্রাকৃত'—সম্ভবত তা ছিল কাশ্মীর ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের প্রাচীন কথ্য ভাষা। এই সাহিত্যিক ব্যবস্থাটা হয়তো তখনকার বাস্তব অবস্থা দেখেই স্থির হয়েছিল—অর্থাৎ মাগধী প্রাকৃত প্রাকৃত-জনের ভাষা, শৌরসেনী প্রাকৃতের মর্যাদা অতুলনীয়। কিন্তু এ রকমের পাকা-পোক্ত ব্যবস্থা থেকেই বোঝা যায়—সাহিত্যে এই সব রীতি ও ব্যবস্থা

অব্দের মধ্যেই তারা সম্ভবত প্রথমে এসেছিল বিদেহে, মগধে ; পরে আসে অঙ্গে, আর তারও পরে বঙ্গে, কলিঙ্গে। যারা এসব দেশে প্রথম আসত, বসবাস করত এখানকার স্থানীয় 'অন্‌-আর্য' অধিবাসীদের সঙ্গে, স্বভাবতই তারা আর্য-সংস্কৃতির আচার-বিচার বিশুদ্ধ রাখতে পারত না। তাই উত্তর-ভারতে বা আর্যাবর্তে ফিরে গেলে তাদের জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হত। এ থেকে বুঝতে পারি, কেন বৈদিক যুগে 'প্রাচ্য'দেরও অসম্মানের চোখেই দেখা হত, আর বঙ্গ জাতিকে বলা হয়েছে 'বয়াংসি', কি না পক্ষিজাতীয়।

খ্রীঃ পূর্ব ৫০০ অব্দের পূর্বেই কিন্তু আর্য-ভাষীদের মধ্যে মগধ রাজ্য প্রাধান্য অর্জন করতে থাকে। তারপরে মৌর্য সাম্রাজ্যের কেন্দ্র হল মগধ। এই মৌর্য যুগ (খ্রীঃ পূঃ ৩।২ শতক) থেকেই বাঙ্‌লা দেশে আর্য-ভাষীদের উপনিবেশ স্থাপিত হতে থাকে। অবশ্য বাঙ্‌লা দেশে অশোকের কোনো অনুশাসন আবিষ্কৃত হয় নি। কিন্তু বগুড়ার মহাস্থান-গড়ের 'সংবঙ্গীয়'দের প্রতি নির্দেশটি রচিত হয়েছে আর্যভাষার 'পূর্বী প্রাকৃতে' এবং উৎকীর্ণ হয়েছে মৌর্যযুগের ব্রাহ্মী লিপিতে। তা থেকে বোঝা যায়, আর্য-ভাষীরা মৌর্যযুগে উত্তর-বঙ্গে এসেছে। নিম্নবঙ্গেও তমলুক, বেড়াচাঁপা প্রভৃতি স্থানে শুঙ্গ, কুশান প্রভৃতি যুগের নানা নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। গুপ্তযুগে (খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতক থেকে ৭ম শতকে) দেখি এই আর্য-ভাষীদের বসতি পশ্চিম বাঙ্‌লার সর্বত্র প্রসারিত হয়েছে। বাঁকুড়ার পোখর্‌ণায় (পুষ্করণ) চন্দ্রবর্মার পুরালিপিটি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ; তার অক্ষর গুপ্তযুগের প্রথম দিক্‌কার ব্রাহ্মী লিপির নিদর্শন। সংস্কৃত তখন দেশের রাজভাষা ; কিন্তু রাজপুরুষেরা মুখে পূর্বী প্রাকৃতেরই কোনো রূপ বলতেন। বাঙ্‌লার ভূমিজ অন্ত্যজেরাও খ্রীষ্টীয় ৮ম শতকের কাছাকাছি এই হিন্দ্‌-আর্য গোষ্ঠীর কথিত ভাষা হিসাবে এই প্রাচ্য প্রাকৃতকে গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছিল, তা অনুমান করা যায়। তারপর গৌড় সাম্রাজ্যের পত্তন হল পাল রাজত্বে (খ্রীঃ ৭৪০ থেকে খ্রীঃ ১,১০০) ; আর গৌড়ভূমি (উত্তর-বঙ্গ) তখন আর্য-সংস্কৃতির এক প্রধান ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। কি 'গৌড়ী রীতি'তে সংস্কৃত রচনায়, কি ভাস্কর্যকলায়, কি বিদ্যাচর্চায়—গৌড় তখন উত্তর ভারতে অগ্রগণ্য। শৌরসেনী প্রাকৃত থেকে 'শৌরসেনী অপভ্রংশ' আগেই জন্মগ্রহণ করেছিল। এই যুগে হিন্দ্‌-আর্য ভাষার প্রাচ্য প্রাকৃতের শাখাগুলির মধ্যেও নূতন বৈশিষ্ট্য ক্রমশ পরিস্ফুট হয়ে উঠতে থাকে। যেমন, 'মাগধী প্রাকৃতে'র মধ্যে পশ্চিম মাগধী ('ভোজপুরিয়া' যার বংশধর), মধ্য মাগধী (মগহী, মৈথিলী প্রভৃতিতে যার পরিণতি) ও পূর্ব মাগধী (বাঙ্‌লা, ওড়িয়া, অসমিয়া যার সন্তান), এরূপ প্রকার-ভেদ তখন লক্ষ্য করা যেত। এর কিছু পরেই দেখা গেল পূর্ব

এখনো বোঝায় মধ্য-পশ্চিম বঙ্গ, 'সুহ্ম' বোঝাত দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গ ; 'পুণ্ড্র বর্ধনভুক্তি' বোঝাত মোটের উপর উত্তর-বঙ্গকে। অবশ্য, এছাড়াও এক একটা অঞ্চলের অন্য নাম ছিল। যেমন, উত্তর-বঙ্গকে পূর্বেও বলত, এখনো বলে, 'বরেন্দ্র' ; 'বরেন্দ্রী' ; 'বঙ্গ' বলতে বিশেষ করে বোঝায় পূর্ব-বঙ্গ (বাংলাদেশ) । আবার 'সমতট', 'হরিকেল' প্রভৃতি ছিল সেই পূর্ব-বঙ্গেরই দক্ষিণাঞ্চলের এক একটা ভাগের নাম। এসব নামের মধ্যে 'গৌড়' ও 'বঙ্গ' এই শব্দ দুটি সুপ্রাচীন, পাণিনিতেও তার উল্লেখ আছে। 'বঙ্গ মগধের' উল্লেখ আছে ঐতরেয় আরণ্যকেও। কিন্তু সমস্ত বাঙ্‌লা দেশের সাধারণ নাম 'বাঙ্‌লা' মুসলমান তুর্ক বিজেতারাই দেন। তার পূর্বে 'গৌড়' বলতে প্রধানত বোঝাত বরেন্দ্রভূমি ; তারপর বাঙ্‌লার অনেকটা অংশ। পরে পাল রাজাদের গৌড় সাম্রাজ্য যতই বিস্তার লাভ করতে থাকে ততই 'পঞ্চগৌড়' 'সপ্ত-গৌড়' বলে উত্তর ভারতের অনেক দূর পর্যন্ত গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত করবার চেষ্টা হয়।

কিন্তু এসব অঞ্চলের মানুষের সাধারণ ভাষা বাঙ্‌লা নয় ; তাই এসব অঞ্চলকে বাঙ্‌লা বলা কখনো সম্ভব নয়। অর্থাৎ বাঙ্‌লা যাঁর আশৈশব নিজস্ব ভাষা তিনিই বাঙালী ; আর যেখানকার সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে কৃষক-শ্রেণী, সাধারণ ভাবে বাঙ্‌লা কথা বলেন সে-দেশই বাঙ্‌লা দেশ—রাষ্ট্র হিসাবে সে-স্থান ভারত বা পাকিস্তান, কিংবা বিহার 'রাজ্য', আসাম 'রাজ্য' বা অন্য যে-কোনো 'রাজ্যে'র অন্তর্ভুক্তই হোক্ তাতে যায় আসে না। তাই জাতি ও দেশের প্রধান এক পরিচয়—ভাষা ; কারণ ভাষা একটা মৌলিক সামাজিক বন্ধন, সংস্কৃতির এক প্রধানতম বাহন, জাতির মানসিক রূপেরও পরিচায়ক।

বাঙ্‌লা ভাষা

বাঙ্‌লা ভাষা কিন্তু অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষাও নয়, দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষাও নয় ; আর ভোট-চীনা গোষ্ঠীর ভাষার চিহ্ন তো এ ভাষায় প্রায় নেই-ই বলা চলে। বাঙ্‌লা ভাষা ভারতীয় 'হিন্দ্-আর্য' গোষ্ঠীর ভাষারই বংশধর। তার কারণ, বাঙ্‌লার প্রাচীনতম অধিবাসী অষ্ট্রিক-দ্রাবিড়-ভোটচীনা প্রভৃতি জাতি-উপজাতিদের হটিয়ে দিয়ে বাঙ্‌লার মাটিতে উপনিবেশ স্থাপন করে ক্রমে ক্রমে আধিপত্য বিস্তার করে উত্তর ভারতের আর্য-ভাষী হিন্দ্-আর্য সভ্যতার ধারক নানা জাতের লোকেরা। তারা সকলে রক্ত হিসাবে বা জাতি হিসাবে 'আর্য' ছিল না। 'আর্য' কথাটাই সম্ভবত মূলত একটা সাংস্কৃতিক নাম। যারা পশ্চিম থেকে বাঙ্‌লা দেশে আসত তারা এই ভাষায় ও সংস্কৃতিতেই ছিল এক গোষ্ঠীর। খ্রীষ্টপূর্ব ১,০০০ থেকে খ্রীঃ ৫০০

বাঙ্‌লা ভাষা কিন্তু কুলীন নয়। 'হিন্দ্‌-আর্য ভাষা'র প্রাচ্য শাখা আদৌ কুলীন বলে গণ্য হত না ; তার কারণ, বাঙালী জাতটাও আসলে বড় বেশী কুলীন জাত নয়।

বাঙ্‌লা দেশ ও বাঙালী জাতি

কারা বাঙ্‌লা দেশের প্রাচীনতম অধিবাসী, আর বাঙালীর রক্তে কোন রক্ত কতটা আছে, এ-বিচার নৃ-বিজ্ঞানের। তবে এ কথা মনে রাখতে হবে—যাঁরা বাঙ্‌লা দেশের আদিবাসী তাঁরা এই বাঙ্‌লা ভাষা বলতেন না, মূলত তাঁরা 'হিন্দ্‌-আর্য'-ভাষী ছিলেন না। নৃ-বিজ্ঞানের মতে বাঙ্‌লার প্রাচীনতম অধিবাসীরা সম্ভবত ছিলেন অস্ট্রিক গোষ্ঠীর অস্ট্রো-এশিয়াটিক্‌ জাতির মানুষ ; তাঁরা ব্রহ্মদেশ ও শ্যামদেশের মোন্‌ এবং কম্বোজের (উত্তর ইন্দো-চীনের) ক্ষের শাখার মানুষদের আত্মীয়। এ জাতীয় মানুষকেই বোধহয় বলা হত 'নিষাদ', কিম্বা 'নাগ' ; আর পরবর্তী কালে 'কোল্ল', 'ভিল্ল', ইত্যাদি। তা হলে অনুমান করা যেতে পারে, তাঁদের ভাষাও ছিল অস্ট্রিক গোষ্ঠীর মোন্‌-ক্ষের-শাখার ভাষার মতোই। অনেকটা এরূপ ভাষাই এখনো বলেন বাঙ্‌লা দেশের পশ্চিমে কোল, মুণ্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসীরা, আর পূর্ব বাঙ্‌লার (এখন আসাম রাজ্যের) খাশিয়া পাহাড়ের খাশিয়ারা। অস্ট্রিক গোষ্ঠী ছাড়াও বাঙ্‌লা দেশে বাস করতেন দ্রাবিড় গোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখার লোকেরা। তাঁরা ছিলেন সুসভ্য জাতের মানুষ। তাঁদের প্রধান বাসভূমি এখন দাক্ষিণাত্য ; তাঁদের প্রধান ভাষা এখন তামিল, তেলুগু, মালয়ালাম ও কন্নড়ী। কিন্তু এক সময়ে তাঁরা সম্ভবত পশ্চিম বাঙ্‌লায় ও মধ্য বাঙ্‌লায়ও ছড়িয়ে পড়েছিলেন। এখনো ছোটনাগপুরের (বিহার রাজ্যে) ওরাওঁ প্রভৃতি জাতেরা দ্রাবিড় গোষ্ঠীরই একটা ভাঙা ভাষা বলেন। অস্ট্রো-এশিয়াটিক ও দ্রাবিড় ভাষীরা ছাড়াও পূর্ব ও উত্তর বাঙ্‌লায় বহু পূর্বকাল থেকে নানা সময়ে এসেছিলেন মঙ্গোলীয় বা ভোট-চীনা গোষ্ঠীর নানা জাতি-উপজাতি—যেমন গারো, বডো, কোচ, মেচ, কাছারি, টিপ্‌রাই, চাক্‌মা প্রভৃতি। সম্ভবত এঁদেরই বলা হত 'কিরাত' জাতি। এঁরা ভোট-চীনা গোষ্ঠীর নানা ভাষা-উপভাষা বলতেন।

অতএব, শুধু নানা ভাষাই যে এই বাঙ্‌লা দেশে প্রাচীনতম কালে চলত তা নয়, দেশটাও ছিল নানা জাতি-উপজাতির বাসভূমি ;—'বাঙালী' বলে একটা গোটা জাতও তাই তখনও পর্যন্ত জন্মায় নি। 'রাঢ়', 'সুহ্ম', 'পুণ্ড্র', 'বঙ্গ' প্রভৃতি প্রাচীন শব্দগুলি প্রথম দিকে বোঝাত বিশেষ বিশেষ জাতি বা উপজাতিকে ; তারপরে তাদের বাসস্থল হিসাবে এক একটা বিশেষ বিশেষ অঞ্চলকে। যেমন, 'রাঢ়' বলতে

প্রবাদ, প্রবচন প্রভৃতি। এসবের মূল বিষয়বস্তু হয়তো খুবই প্রাচীন। কিন্তু এসব বাঙ্‌লার লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। কোনো কোনো জিনিস সাহিত্য-গুণযুক্ত; কোনো কোনো জিনিস তা নয়। এসব জিনিস আগে কোনোদিন লিখিত রূপ পায় নি। তাই লোকের মুখে মুখে ভাষায়, এবং কতকটা ভাবেও, তার এত অদল-বদল হয়েছে যে, তার বর্তমানকালীন রূপকে আর প্রাচীন সাহিত্যের নমুনা বলে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

পিশেল সাহেবের মতো কোনো কোনো পণ্ডিত বলেছেন যে, জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দ' প্রথমত মাত্রাবৃত্ত ছন্দে অপভ্রংশে বা বাঙ্‌লায় রচিত হয়ে থাক্‌বে; পরে কবি তা সংস্কৃতে ঢালাই করেছেন। কিন্তু একথা অধিকাংশ পণ্ডিতই গ্রহণ করেন নি। বরং ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁরাই জানেন যে, মুখের ভাষা দেশে দেশে কালে কালে যতই পরিবর্তিত হোক্ খ্রীষ্টীয় অব্দের প্রথম দিক থেকেই সংস্কৃত প্রায় বরাবরই ছিল সমস্ত ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক জীবনের ভাষা। 'পালি' বৌদ্ধদের কাছে ও 'অর্ধমাগধী' জৈনদের কাছে কিছুকাল তাদের নিজ নিজ ধর্মগত আলোচনা ও সংস্কৃতির বাহন ছিল। পরে, খ্রীষ্টীয় প্রায় ৮০০ থেকে ১,০০০ শতকের মধ্যে 'শৌরসেনী' প্রাকৃতের সন্তান শৌরসেনী অপভ্রংশ বা 'অবহট্‌ঠ'ও রাজপুত রাজাদের প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন উত্তর-ভারতের প্রায় রাষ্ট্রভাষা হয়ে উঠেছিল। সেই প্রাচীন বাঙ্‌লার যুগে বাঙালী পণ্ডিতেরাও তাই বাঙ্‌লায় কবিতা লিখুন আর না লিখুন, পারলে কাব্যচর্চা করতেন সংস্কৃতে। 'অবহট্‌ঠে' কবিতা রচনায়ও তাঁদের উৎসাহ ছিল, তা দেখ্‌তে পাই। কারণ, বাঙ্‌লার উচ্চবর্গের সুধী-সজ্জনের চক্ষে তখন পর্যন্ত বাঙ্‌লা ভাষা ছিল শৌরসেনী-অপভ্রংশেরও তুলনায় শাদা-মেটে গ্রাম্য জিনিস।

যাই হোক্, মোটামুটি ধরা যায় যে প্রায় হাজার খানেক বৎসর আগেই বাঙ্‌লা ভাষা জন্মগ্রহণ করে। ভারতের অন্যান্য প্রধান প্রধান আধুনিক ভাষাগুলিও খ্রীষ্টীয় ১০ম থেকে ১২শ শতকের মধ্যেই উদ্ভূত হয়। অবশ্য সে-সব কোনো কোনো ভাষার নিদর্শন মেলে একটু আগে, কোনো ভাষার বা একটু পরে। তা ছাড়া সব ভাষাতেই যে তখন-তখনি সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল, তা-ও নয়। তবে ভারতের 'হিন্দ-আর্য ভাষা' (পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ভারতের যে-ভাষার নামকরণ করেছেনে 'ইন্দো-এরিয়ান্' বলে, আমরা তাকে এ নামে অভিহিত করতে চাই) তখন 'প্রাচীন স্তর' ও 'মধ্য স্তর' উত্তীর্ণ হয়ে উত্তর ভারতে 'আধুনিক স্তরে' এসে পৌঁছয়। এই হিন্দ্-আর্য ভাষারই প্রাচ্য শাখার এক প্রধান প্রতিনিধি বাঙ্‌লা (বা 'বঙ্গ ভাষা')। ভাষা হিসাবে

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাঙ্‌লা ভাষা ও বাঙালীর সাহিত্য

প্রাচীনতম নিদর্শন

'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্‌লা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা'—এই নামে 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়', সেই সঙ্গে সরোজ বজ্রের (সরহপাদের) 'দোহাকোষ' ও কাহ্নপাদের 'ডাকার্ণব' এই তিনখানা পুঁথি একত্র সম্পাদিত করে স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় হর-প্রসাদ শাস্ত্রী 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে'র পক্ষ থেকে বাঙ্‌লা ১৩২৩ সালে (ইংরাজী ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে) একখানা কবিতা-সংগ্রহ প্রকাশ করেন। এর মধ্যেকার 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়'ই একমাত্র খাঁটি বাঙ্‌লায় লেখা 'পদ' বা গান বলে গ্রাহ্য হয়েছে। সাধারণত 'চর্যাপদ' বলেই বাঙ্‌লা সাহিত্যে এর পরিচয়,—যদিও আসল নাম কারও কারও মতে 'চর্যাচর্য বিনিশ্চিয়', 'চর্যাশ্চর্য বিনিশ্চয়', ইত্যাদি। অর্থাৎ নামের সম্বন্ধে বিনিশ্চিত হবার উপায় এখন আর নেই; তবে 'চর্যাপদ' নামটিই আধুনিক বাঙ্‌লা সাহিত্যে প্রচলিত। এখনও পর্যন্ত এই চর্যাপদই বাঙ্‌লা সাহিত্যের আদিগ্রন্থ, আর তার অন্তর্ভুক্ত পদগুলিই প্রাচীনতম বাঙ্‌লা সাহিত্যের নিদর্শন। এই পদগুলোর বয়স প্রায় এক হাজার বৎসর বা তার কাছাকাছি।

অবশ্য চর্যাপদের এই পদগুলি ছাড়াও প্রাচীন বাঙ্‌লা ভাষার আরও কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়; কিন্তু তা ভাষারই নমুনা, সাহিত্য নামের যোগ্য নয়। এ সবের মধ্যে গণনা করা হয়—পুরালিপি বা পুঁথিপত্রে প্রাপ্ত প্রাচীন বাঙ্‌লার পল্লী ও স্থানের কিছু কিছু নাম; অমরকোষের ভাষ্য সর্বানন্দের 'টীকাসর্বস্ব'তে (১১৫৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে এ টীকা সংকলিত হয়) উল্লিখিত প্রায় ৩০০ বাঙ্‌লা শব্দ; 'প্রাকৃত পৈঙ্গলে'র (১৪শ শতাব্দীর শেষদিককার প্রাকৃত পদসংগ্রহ) এখানে-ওখানে প্রাপ্ত কয়েকটি বাঙ্‌লা পদ ও শ্লোক এবং দু'একটি বাঙ্‌লা বাক্যাংশ;—মহারাষ্ট্রের এক চালুক্য রাজার নির্দেশে (খ্রীঃ ১১২৯-৩০) সংকলিত 'অভিলাষ চিন্তামণি' নামে বিশ্বকোষ-জাতীয় গ্রন্থের দশাবতার স্তোত্রের অন্তর্ভুক্ত দুটি বাঙ্‌লা শ্লোকের টুকরো। বাংলা ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে এসব হয়তো মূল্যবান, কিন্তু বাঙ্‌লা সাহিত্যের পক্ষে এদের কোনো মূল্য নেই।

বাঙালী জীবন ও বাঙ্‌লা সাহিত্যের বিষয়বস্তু হিসাবে এ সবের চেয়ে বরং মূল্যবান—বাঙ্‌লার খনার বচন, ডাকের বচন, রূপকথা, উপাখ্যান, ব্রতকথা, ছড়া,